রাসু হাড়ি

(গল্পগ্রন্থ – মুখোশ ও মুখশ্রী)

সেবার আষাঢ় মাসে আমাদের বাড়ি একজন লোক এসে জুটলো। গরিব লোক, খেতে পায় না—তার নাম রাসু হাড়ি। আমরা তাকে সাত টাকা মাইনে মাসে ঠিক করে বাড়ির চাকর হিসেবে রেখে দিলাম। প্রধানত সে গরুবাছুর দেখাশুনো করতো, ঘাস কেটে আনত নদীর চর থেকে,সানি মেখে দিত খোল জল দিয়ে।

বাবা মারা গিয়েছিলেন আমাদের অল্পবয়সে। তিন ভাইয়ের মধ্যে আমি বড়, লেখাপড়া আমার গ্রাম্য পাঠশালা পর্যন্ত। ছোট ভাই দুটি ডান্ডাগুলি খেলে বেড়াতো, এখন চাষের কাজে আমাকে সাহায্য করে।

রাসু বছরখানেক কাজ করার পরে একদিন রাত্রে আমাদের বড় বলদজোড়া নিয়ে অন্তর্ধান হল। আমাদের চক্ষুস্থির, তখনকার সস্তার দিনেও যে গরুজোড়ার দাম দু'শো টাকা। আমার ছোট ভাই সত্যচরণের (ডাক নাম নেন্টু) বড় সাধের বলদ, সে ভালো গাড়ি চালাতে পারতো বলে শখ করে জন্তিপুরের গোহাটা থেকে ওই গরুজোড়া কিনে এনেছিল।

ভোরবেলা মা ওঠেন সকলের আগে। সেদিন উঠে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে দেখেন রাসু নেই, যে কম্বলখানা গায়ে দিয়ে শুতো সেখানাও নেই। গোয়ালে দেখেন বলদজোড়াও নেই।

আমাকে উঠিয়ে বল্লেন, হ্যাঁরে নীলে, রাসু গেল কোথায় জানিস?

আমার তখন বিয়ে হয়নি, সত্য আর আমি এক ঘরে শুই। আমি উঠে চোখ মুছতে মুছতে বল্লাম, তা কি জানি? মাঠের দিকে গেল না তো?

—এত ভোরে সে কোনোদিন মাঠে যায় না, আজ গেল কেন? বড় গরুজোড়াও তো দেখচিনে!

—গরুকে কি মাঠে খাওয়াতে নিয়ে গেল?

—এত সকালে আর এই শীতে? কখনো তো যায় না।

—তাই তো। দাঁড়াও উঠি আগে।

বহু খোঁজাখুঁজি হল সারাদিন ধরে।

রাসু হাড়ি না-পাত্তা। নির্ঘাত ভেগেছে গরুজোড়া নিয়ে। অমন গরুজোড়া।

সত্য তো পাগলের মতো হয়ে গেল। ওর গায়ে খুব জোর, খুব সাহসী আর তেজী ছোকরা। বল্লে, দাদা চল, ওর বাড়ি সেই বেলডাঙ্গা যাবো।

—কে যাবে?
—তুমি আর আমি।
—জানিস ওর বাড়ির ঠিকানা?
—বেলডাঙ্গা থানা, মাঠ-বেনাদহ গ্রাম। ও দুবার চিঠি পাঠিয়েচে ওই ঠিকানায়।

—ডাকঘর?
—ওই বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ।
—বাবাঃ, সে কদ্দূর এখেন থেকে! ও থাকগে।

সত্য কিছুতেই শুনলো না। তার পীড়াপীড়িতে দুই ভাই পুঁটুলি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুলাম। বত্রিশ টাকা সঙ্গে নিয়ে।

সোজা গিয়ে বেলডাঙ্গা স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলাম।

জিজ্ঞেস করে জানা গেল মাঠডা-বেনাদহ এখান থেকে তিন মাইলের মধ্যে। বেলডাঙ্গার থানাতে গিয়ে দারোগাবাবুকে সব খুলে বল্লাম। তাঁর নাম পঞ্চানন রায়, বাড়ি হুগলী জেলা। আমাদের মুখে সব শুনে তাঁর দয়া

হল। আমাদের বল্লেন সেখানে কিছুদিন থাকতে, অন্তত এক সপ্তাহ। সাধারণ পোশাকে তিনি দু'জন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে নিজে বেনাদহ গ্রামে দিয়ে খবর নিয়ে এলেন, সে বাড়ি নেই।

আমাদের বল্লেন, থানায় রাত্রে শুয়ে থাকবেন, কোনো অসুবিধে হবে না। রেঁধে খেতে পারেন, কিংবা যদি না রেঁধে খেতে চান, আমার এক ছত্রি কনস্টেবল আছে—

সত্য বললে, কিছু না দরোগাবাবু, আমরা রান্না করেই নেবো।

থানার উত্তরে বড় এক পুকুর, পুকুরের পাড়ে উলুটি বাচড়া ও তাল গাছ। আমাদের যশোরের ভাষায় উলুটি বাচড়া বলে উলুঘাসে ঢাকা মাঠকে। দেখে সত্য খুব খুশি। বলে, দাদা ওই তাল গাছের তলায় আধ-ছায়া আধ-রৌদ্রে বসে রাঁধবো।

দিনকয়েক সেখানে থাকা হল, বেনাদহ গিয়ে রাসু হাড়ির সন্ধান সব সময়ে নেওয়া হচ্ছে। কখনো রাতদুপুরে, কখনো দিনদুপুরে, কখনো খুব ভোরবেলায়। গাঁয়ের লোকে বলে সে যশোর জেলায় ব্রাহ্মণদের বাড়ি চাকরি করে। এখানে থাকে না তো। আজ এক বছরের মধ্যে তাকে গাঁয়ে দেখা যায়নি।

সুতরাং সাত দিন পরে আমরা রাসু হাড়িকে অপ্রকট অবস্থায় রেখেই বেলডাঙ্গা থেকে রওনা হলাম বাড়ির দিকে।

সত্য বললে, দাদা পয়সা নেই হাতে, তা ছাড়া রাস্তা দেখে যেতে হবে। যদি এমন হয় পথ দিয়ে গরু তাড়িয়ে বাড়ির দিকে আসচে—চলো হেঁটে বাড়ি ফিরি।

—সে কি রে! এখান থেকে যশোর জেলা—পথটি যে সোজা নয়। পারবি হাঁটতে?

—গরুজোড়া ফেরত পাওয়ার জন্যে সব করতে পারি দাদা। আমার গাড়ি চালানো একদম বন্ধ হয়ে গেল ওই গরুজোড়ার অভাবে।

অতএব নামলাম দুই ভাই পথে।

বেলডাঙ্গার বাজার থেকে চালডাল কিনে নিই। হাঁড়ি-সরা কিনে বোঁচকায় বেঁধে নিলাম। প্রথম দিন রাস্তার ধারে এক আমতলায় রান্না করে খেলাম। বেশ লাগে কিন্তু এভাবে পথ চলতে। ঘর থেকে কখনো বেরুইনি, এতদূরেও জীবনে কখনো আসিনি, রাসু হাড়ির দৌলতে অনেক দেশ দেখলাম।

সত্য বললে, দাদা, হাঁড়ি ফেলে দিয়ে কাজ নেই। বড্ড দাম হাঁড়ির। ধুয়ে নিয়ে আসি পুকুর থেকে, বোঁচকায় বেঁধে নিই। নইলে কত পয়সা লেগে যাবে রোজ হাঁড়ি কিনতে।

সন্ধ্যার আগে আশ্রয় নেবার জন্যে একটা কি গ্রামে ঢুকে সামনের একটা বাড়িতে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাড়ির লোকেরা ঘুঁটের আগুন পোয়াচ্চে উঠোনে। আমাদের কথা শুনে বললে, এখানে জায়গা হবে না, আমাদের তাই থাকবার জায়গা নেই। এগিয়ে গিয়ে গাঁয়ের মধ্যে দ্যাখো গে।

কিছুদূর গিয়ে আর একটি বাড়ি পেলাম রাস্তার বাঁ-ধারে। বাড়ির সামনে গোয়ালঘর, প্রথম শীতে লাউগাছে মাচাভরা লাউ ঝুলচে। মেটে ঘর দু'তিনখানা, উঠোনের পেছনদিকে এক ঝাড় তলদা বাঁশ। বুড়ো-মতো একটা লোক তামাক খাচ্ছিল দাওয়ায় বসে, আমাদের দেখে বললে—কে তোমরা?

আমি বললাম, পথ-চলতি লোক।

—এখানে কি মনে করে?

—একটু থাকবার জায়গা দ্যাও কর্তা। অনেক দূর থেকে আসচি, বড় কষ্ট হয়েচে।

—তোমরা?

—আমরা ব্রাহ্মণ।

—গিয়েছিলে কোথায়?

তখন সব কথা খুলে ওকে বললাম—রাসু হাড়ির আনুপূর্বিক ঘটনা। লোকটা নির্বিকার ভাবে তামাক টানতে টানতে সব শুনলে। আমাদের কথা শেষ হয়ে গেলে হুঁকোয় শেষ টান দিয়ে পিচ করে থুতু ফেলে শান্ত ও ধীরভাবে বললে, এখানে থাকার অসুবিধে, আগে দ্যাখো—

—এই দাওয়াটায় না হয় শুয়ে থাকবো। এই শীতে—

—এখানে সুবিধে হবে না।

সত্য বললে, এগিয়ে চলো দাদা। এখানে দরকার নেই।

কিছুদূর গিয়ে আমরা একটা বাড়ির পেছনদিকটাতে পৌঁছলাম। বাড়ির মধ্যে মুড়ি ভাজার গন্ধ বেরুচ্চে এবং খোলা হাঁড়িতে মুড়ি ভাজার চড়বড় শব্দ হচ্চে। আমরা ঘুরে গিয়ে বাড়ির উঠানে ঢুকলাম। একটা কালোমতো বেঁটে লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। আমাদের দিকে কটমট করে চেয়ে বললে,কে তোমরা? কি চাই?

—আমরা বিদেশী পথিক, বেলডাঙ্গা থেকে আসচি। একটু থাকবার জায়গা হবে রাত্তিরে?

—কি জাত তোমরা?

—ব্রাহ্মণ। আমাদের সঙ্গে চালডাল আছে, নিজেরা রেঁধে খাবো।

লোকটা যেন একটু নরম হয়ে বললে, দাঁড়াও জিগ্যেস করে আসি।

বাড়ির মধ্যে থেকে এবার বেরিয়ে এল একটি মেয়েমানুষ, কালো, ঢেঙা, হাতে কুঁচিকাঠি। ইনিই মুড়ি ভাজছিলেন তা হলে! আমাদের দিকে চেয়ে বললে, কে গা তোমরা?

—আমরা ব্রাহ্মণ, একটু থাকবার জায়গা চাই।

—এখানে জায়গা হবে না, আগে দ্যাখো।

—আগে কোথায় দেখবো?

—ওমা, তোমরা জানো না নাকি? আগে কত লোক আছে—দ্যাখো গে যাও।

—আমরা নতুন লোক। কি করে জানবো লোক আছে কিনা।

—সামনে এগিয়ে দেখ না।

—জায়গা একটু হবে না? আমরা নিজেরা রেঁধে খেতাম!

বার বার বলছি হবে না, তুমি বাপু কি রকম লোক?

বলেই মেয়েমানুষটি আমাদের দিকে পিছন ফিরে একপাশ ঘুরে চলে গেল বিরক্তভাবে।

সত্য বললে—দাদা উপায়? কেউ তো জায়গা দেয় না দেখচি। রাত বেশ হল।

—চল দেখি এগিয়ে!

—আমাদের কি চোর-ডাকাত ভাবচে নাকি?

—কি করে বলবো, চল দেখি এগিয়ে।

এবার একটা পাকা দালান-বাড়ির বাইরের রোয়াকে আমরা ক্লান্তভাবে এসে বসে পড়লাম বোঁচকা নামিয়ে। অনেকক্ষণ পরে একজন লোক বাড়ি থেকে বের হয়ে কোথায় যাচ্ছিল লণ্ঠন হাতে,আমাদের দেখে বিস্ময়ের ভাবে বললে—কে তোমরা?

—আমি বললাম—একটুখানি শুয়ে থাকবার জায়গা দেবেন রাত্তিরে? আমরা ব্রাহ্মণ, বাড়ি যশোর জেলা, বেলডাঙ্গা থেকে আসচি।

—হেঁটে আসচো?

—হ্যাঁ।

—তা থাকো শুয়ে।

ব্যাস, এই পর্যন্ত। বললে না উঠে বৈঠকখানার মধ্যে গিয়ে শোও, কিংবা তোমরা খাবে কি—কিছু না। সেই যে গেল, আর তাকে দেখলামও না। আর কোনো খোঁজখবরও ও নিলে না আমাদের।

সেই শীতের রাত্রে খোলা রোয়াকে কাপড় পেতে দুই ভাই শুয়ে রইলাম। কি করি!

সত্য বললে—রাসু হাড়ির সঙ্গে একবার দেখা হ'ত, তার মুণ্ডুটা ভেঙে দিতাম এক ঘুঁষিতে!

সত্য বেশ জোয়ান ছোকরা, খেতেও পারতো অসম্ভব। একসের রান্না-করা মাংস আর আধসের চালের ভাত একা খেতে পারতো।

বেলডাঙার বাজারে সস্তা ডিম দেখে ও বলতো—দাদা, রোজ চারটে ডিম এক-একবারে ভাতে দিয়ো আমার জন্যে। খুব করে ডিম খেয়ে নিই।

আরো বেশি করে তার কথা মনে পড়চে, কারণ—

কিন্তু থাক সে সব এখন।

আরো একদিন কাটল পথে।

বেথুয়াডহরি ছাড়ালাম। আরো এগিয়ে যাই দুজনে। জগদানন্দপুর বলে গ্রামের হাটে বড় একটা মাছ কিনলাম বেলা দশটার পরে। খিদেও পেয়েচে বেশ। একটা বড় পুকুরের ধারে আম গাছের ছায়ায় সত্য উনুন খুঁড়তে লাগলো, আমি মাছ কুটবার ছাই কি করে জোগাড় করি তাই ভাবচি, এমন সময় সত্য বললে—ওই দ্যাখো দাদা ।

যা দেখলাম তা এখনো মনে আছে, আজ এই চোদ্দো-পনেরো বছর পরেও—

একটি সুন্দরী বৌ গামছা কাঁধে নিয়ে আমাদের দিকে আসতে আসতে পথের অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন থমকে। আমরা রান্না করতে বসেছি পথের ধারেই। এই পথটা নিশ্চয়ই পুকুরঘাটে যাওয়ার পথ। বৌটি অপরিচিত লোকদের দেখে ঘাটে যেতে পারচেন না। ভদ্রলোকের মেয়েদের স্নানের ঘাটে যাবার পথের ধারে আমাদের রান্না করতে বসা উচিত হয়নি।

সত্য বললে—দাদা, ঘাটের পথে বসেচি, কি করি উঠে যাবো?

হঠাৎ দেখি বৌটি যেন আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে ফিরে গেলেন। অমন রূপসী বৌ এমন পাড়াগাঁয়ে দেখবো আশা করিনি। আমাদের ভয়ও হল। সত্য বললে—যাঃ, ফিরে চলে গেল বৌটি। আমরা না বুঝে অন্যায় করে ফেলেচি—চলো সরে যাই।

পরক্ষণেই ভয়ের সুরে বললে—দাদা লোক আসচে এদিকে, বৌটি গিয়ে বাড়িতে বলে দিয়েচে—চলো পালাই—মারবে—

আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম—কেন,পালাতে হবে কেন? কি করেচি আমরা? মার বুঝি সস্তা?

দুটি ছোকরা এসে আমাদের কাছে দাঁড়ালো—আপনারা আসচেন কোথা থেকে?

আমি বললাম, বেলডাঙা।

—যাবেন কোথায়?

—যশোর জেলা।

—আপনারা ব্রাহ্মণ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিছু মনে করবেন না, আমাদের খুড়িমা (আমরা ভাবচি, এই রে! এইবার আসল কথা বলবে) এসেছিলেন ঘাটে নাইতে। তিনি ফিরে গিয়ে বললেন, দুটি ব্রাহ্মণের ছেলে আমাদের বাড়ির সামনে উনুন খুঁড়ে রেঁধে খেতে যাচ্চে এই দুপুরবেলা। ওঁদের গিয়ে বাড়িতে ডেকে আনো। তা আপনারা দয়া করে বলুন আমাদের ওখানে। আমি জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্চি।

আমরা তো অবাক। এমন কথা বিদেশে কখনো শুনিনি। লোকে একটু শোবার জায়গাই দিতে চায় না, আর কি না রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে যেতে চাইচে! সত্য বললে, ও দাদা!

—কি?

—যাবে নাকি?

ছোকরা দুটি বলে—যেতেই হবে। খুড়িমা নইলে ছাড়বেন না। আমাদের হুকুম, নিয়ে যেতেই হবে আপনাদের। নে বলাই, ওঁদের বোঁচকা দুটো তোল—

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি, সত্য আর আমি। আমাদের কোনো আপত্তিই গ্রাহ্য করলে না ওরা, নিয়েই গেল। একতলা কোঠাবাড়ি, বাড়ির উঠানে ডানদিকে দুটো বড় গোলা, তার পাশেই গোয়ালবাড়ি, সামনে ছোট বৈঠকখানা। আমরা বাড়ির উঠানে পা দিতেই একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বল্লেন—আসুন আসুন—আপনারা ব্রাহ্মণের ছেলে, এই দুপুরবেলা বাড়ির সামনে রেঁধে খাবেন, এ কখনো হয়? বড় বৌমা দেখে এসে বললেন, ওঁদের নিয়ে এসো বাড়িতে। আসুন, বসুন—

আমরা তত লেখাপড়া জানিনে, চাষবাস করে খাই। শিক্ষিত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের মিশতে ভয় হয়। বিশেষ করে তো সত্যর। সে গরুর গাড়ি চালায়। সে বললে—দাদা, এগিয়ে যাও—

এগিয়ে গেলাম আমিই।

ওরা আমাদের নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসালে। পা ধোয়ার জল এনে দিলে। তারপর এল চা আর জলখাবার, ফলমূল আর ঘরের তৈরি ক্ষীরের সন্দেশ, নারকেল নাড়ু।

কর্তার নাম হরিচরণ সেন, ওঁরা জাতে বৈদ্য। আমাকে বললেন—রান্না অবিশ্যি আপনাদেরই করতে হবে। স্নান করে নিন আগে।

সত্য বললে, তুমি রান্না করো গিয়ে দাদা। ওঁদের বাড়ির মধ্যে রান্নাঘর, আমার লজ্জা করে—

স্নান সেরে অগত্যা আমাকেই যেতে হল রান্নাঘরে।

সেই সুন্দরী বৌটি দেখি সেখানে উপস্থিত। মুখের ঘোমটা খুলেছেন। সুন্দর মুখ। তেমনি কাঁচা হলুদের মতো রং। আমার দিদির বয়সী হবেন, আমার ইচ্ছে হতে লাগলো প্রণাম করবার। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, ওঁরা বৈদ্য, কি মনে করবেন।

আমি বল্লাম, দিদি, আপনার বড় দয়া।

দিদি মুখের ঘোমটা আরো খুলে বল্লেন, দয়া কিসের? ওকথা বল্লে আমাদের পাপ হয় না? বলতে আছে? ছিঃ—

—না বলেও তো পারছি নে দিদি।

—না, বলতে হবে না। রান্না করতে জানেন?

আমি হেসে বল্লাম, পারিনে তো করে খাচ্ছি কি করে, হ্যাঁ দিদি? আমার ভাই বাইরে বসে আছে, সে আরো ভালো রান্না করতে পারে।

—কই তিনি বাইরে বসে আছেন কেন? ডেকে আনুন গিয়ে, দেখি কেমন রাঁধেন!

—সে আসবে না, বড় লাজুক।

—আপনার ছোট?

—পাঁচ-সাত বছরের ছোট।

—ডেকে আনুন। আমি রান্নার জিনিসপত্তর আনি। ডাল রান্না করতে পারবেন তো?

—খুব।

জিনিসপত্র যা তিনি আনলেন, তা অনেক রকম। চাল, ডাল, ঘি, দুধ, আলু,বেগুন, কইমাছ। বল্লেন, সরুন, আমি কুটে বেছে দিই। ভালো কথা, আপনারা যে মাছ কিনেছিলেন, সে মাছটা ভালো না, পচা? সেটা কুটে ঝাল দিয়ে রান্না করতে দিয়েছি। ও মাছ আপনাদের খেতে দেবো না। বিদেশী লোক, পচা মাছ খেয়ে অসুখ-বিসুখে পড়বেন শেষকালটাতে! সে হবে না বাপু।

—একদম পচা? আমি কিনিনি, সত্য কিনেচে।

—ছেলেমানুষ, ঠকেছে। কই তাকে ডাকুন না।

—সে আসবে না দিদি। সে থাকুক বসে বাইরে। বড্ড লাজুক। ঘেমে উঠবে এখানে এসে। তা ছাড়া আমরা হলাম পাড়াগেঁয়ে মুখ্যসুখ্যু বামুন। লোকের সঙ্গে কথা বলতে মিশতে আমাদের লজ্জা হয়। আপনাকে দিদির মতো দেখছি বলে কোনো লজ্জা হচ্চে না, কিন্তু অন্য জায়গা হোলে—

—সে কথা থাক। আপনি কি রকম রাঁধেন দেখবো—মাছের ঝোলে কি বাটনা দিতে হবে বলুন তো?

—জানিনে। কখনো তো রাঁধিনি।

—বিদ্যে বুঝেচি। আচ্ছা আমি সব বলে দিচ্চি, আপনি রেঁধে যান। বেলা হয়েছে, খিদে পেয়েচে আপনাদের।

দু'ঘণ্টা ধরে তিনি বসে বসে আমাকে দিয়ে রাঁধালেন। কখন মাছ ভাজতে হবে, কখন কি বাটনা কিসে দিতে হবে, সাঁতলাবার সময় কি ফোড়ন দিতে হবে। দুধ নিয়ে এলেন প্রায় দেড়সের। পায়েস করতে হবে নাকি। আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলাম—আমার দ্বারা আর কিছু হবে না।

তিনি বল্লেন—তা ভালো, থাক, খিদেও পেয়েছে আপনাদের বুঝতে পারচি—ওবেলা হবে।

আমি একটু-আধটু গান করতে পারতাম। বিকালবেলা আমার সে বিদ্যের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো আমার ভাইয়ের মুখ থেকে। সন্ধ্যার পরে এল হারমোনিয়াম ও ডুগি-তবলা। আমার গান শুনে অনেকে সুখ্যাতি করতো তখন। গান ভালোই গাইতাম। রাত্রে রান্না করবার সময় দিদি বল্লেন—আপনি এমন চমৎকার গান গাইতে পারেন ভাইটি।

সলজ্জ সুরে বল্লাম, কি এমন গান?

—আপনাকে এখন ছাড়চিনে। থাকুন দিনকতক এখানে। রোজ গান শুনবো।

—সে তো আমার ভাগ্য। কিন্তু দিদি আমার যে থাকবার জো নেই, পড়ে গিয়েছি এক ফেরে।

—কি ফের ?

আমি রাসু হাড়ির গোরু চুরির বৃত্তান্ত আগাগোড়া বল্লাম। দিদি সব শুনে গালে হাত দিয়ে কি চমৎকার সুশ্রী ভঙ্গি করে বল্লেন, ওমা আমি যাবো কোথায়!

সুন্দরী মেয়ে, কি অপূর্ব সুন্দর যে দেখাচ্ছিল ওই মুহূর্তটিতে।

বল্লাম—আপনি তো দেবীর মতো। কেউ জায়গা দিতে চায় না বিদেশী দেখে—তিন রাত কি কষ্ট পেয়েছি দিদি। আপনার মতো মানুষ ক'জন, যে রাস্তা থেকে লোক ধরে বাড়ি নিয়ে এসে খাওয়ায়? আপনি বুঝতে পারবেন না, মানুষ কত দুষ্টু হতে পারে!

দিদি হেসে বল্লেন—আমার একটা সাধ ছিল—আপনি দিদি বলে ডেকে সে সাধ আমার পুরোতে দিলেন কই?

—কেন? কি সাধ?

—জানেন, আমার অনেক দিনের সাধ ব্রাহ্মণ অতিথি আমাদের বাড়ি আসবেন, আমি তাঁর পা ধুয়ে দেবো নিজের হাতে—কিন্তু আপনার বেলা তা করতে পারলাম না, দিদি বলে ডাকলেন!

—সে আমাদের মতো ব্রাহ্মণ নয় দিদি। আমরা চাষবাস করে খাই। লেখাপড়া জানিনে। আমাদের কথা বাদ দিন।

—তাতে আমার কি, আপনি কি করেন আমাদের দেখবার দরকার কি? যাক গে, এখন বলুন ক'দিন থাকতে পারবেন?

—কালই যাবো।

—কাল যাবার কথা ভুলতে হচ্চে। পরশু বিবেচনা করে দেখা যাবে। এখন বলুন তো, মাংস খান তো?

—খাই।

—শুনুন, কাল রাত্রে লুচি-মাংস করবো। লুচি আমি ভাজবো,তাতে কোনো দোষ নেই—আপনি শুধু মাংসটা রেঁধে নেবেন।

—আপনি যখন দিদি, মাংস রাঁধলেনই বা—

—সে হবে না, ব্রাহ্মণকে রেঁধে খাওয়াতে পারবো না এ বাড়িতে—

—বড্ড সেকেলে আপনি। ঠাকুমা-দিদিমাদের মতো সেকেলে। বলুন ঠিক কিনা?

দিদি শুধু হাসলেন,কথার উত্তর দিলেন না।

পরদিনও পরম যত্নে-আদরে কাটলো ওঁদের বাড়ি। সন্ধ্যার আগেই গানের ব্যবস্থা হল। বাড়ির মেয়েরা আড়াল থেকে গান শুনলেন। আমি অনেকগুলো গান গাইলাম। রান্নাঘরে যেতেই দেখি দিদি গরম চা নিয়ে বসে আছেন। বল্লেন—বড্ড পরিশ্রম হয়েচে। গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে মাংসটা চড়িয়ে দিন। মেখে চুকে ঠিক করে রেখেচি। কষে নিন আগে। শুনুন, পেঁয়াজ দিইনি কিন্তু।

—কেন,আপনাদের পেঁয়াজ চলে না?

—আমাদের চলে। আপনাদের চলবে কি না—

—খুব চলে। দিন পেঁয়াজ-বাটা—

—কি সুন্দর গান গাইলেন আপনি। সত্যিই চাষবাস করেন?

—সত্যি। গান গাইলে চাষবাস করা যায় না, হ্যাঁ দিদি?

দিদি হেসে চুপ করে রইলেন। অনেক সময় কথার উত্তর না দেওয়া ওঁর একটা স্বভাব। পরদিন সকালেই আমরা দু'জন ওঁদের কাছে বিদায় নিলাম।

দিদি ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে আর সত্যকে বসিয়ে শসাকাটা, কলা, শাঁকআলু, ক্ষীরের ছাঁচ ইত্যাদি রেকাবিতে সাজিয়ে সামনে দিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে চোখে সত্যি জল এল আমার।

বার বার বলে দিলেন—আবার আসবেন অবিশ্যি অবিশ্যি। বেলুর বিয়ে হবে বোশেখ মাসে, সেসময় চিঠি যাবে—ভুলবেন না দিদির কথা।

আসবার সময় কর্তাকে বল্লাম—দিদির মতো মানুষ দেখিনি কর্তামশায়—

বৃদ্ধ বল্লেন—বড় বৌমা তো? এ বাড়ির লক্ষ্মী। ওঁর থেকেই সংসারের উন্নতি। উনি আসার পর থেকে সংসার যেন উথলে পড়লো। আর মা'র আমার কি দয়া ! পাড়ার কেউ অভুক্ত থাকবে না। সব খবর নিজে নেবেন। দু'তিনটি স্কুলের ছেলেকে মাইনে দিচ্ছেন এই পাড়ার। যে এসে ধরবে, 'না' বলতে জানেন না। মা আমার স্বয়ং লক্ষ্মী—রূপে-গুণে লক্ষ্মী।

ভুলিনি তাঁর কথা।

আজ চোদ্দো বছর হয়ে গেল। এখনো মনে জ্বলজ্বল করচে সে মূর্তি।

আর সেখানে যাওয়া হয়নি। কোনো খোঁজখবরও নেওয়া হয়নি। আজ কেন একথা মনে উঠলো এতদিন পরে, বলি সেউপসংহারটি।

দিন-পাঁচ-ছয় আগে আমার ভগ্নীপতি মনোমোহন রায় দফাদার সেই রাসু হাড়িকে গ্রেপ্তার করে বিকেলবেলা আমার বাড়িতে নিয়ে হাজির। রাসু হাড়ি জয়দিয়ার বাঁওড়ের ধারে শুয়োরের পাল চরাচ্ছিল—এখান থেকে এগারো মাইল দূরে। মনোমোহন থানায় হাজিরা দিতে যায় রোজ বৃহস্পতিবারে এই পথ দিয়ে। রাসু হাড়িকে দেখে চিনতে পেরেচে এবং চৌকিদার দিয়ে তক্ষুনি গ্রেপ্তার করিয়ে আমার এখানে নিয়ে এসেছে। রাসু এসে বসে চারিদিকে চেয়ে বল্লে—এঃ, বাবুদের বাড়ি এ কি হয়ে গিয়েচে? চণ্ডীমণ্ডপ নেই, গোলা নেই—কোঠা ভেঙে গিয়েচে! লাঙল-গরুও নেই দেখচি!

আমার মাকে দেখে বল্লে—মা ঠাকরুন, এত বুড়ো হয়ে গিয়েচেন? আপনাকে যে আর চেনাই যায় না—ছোটবাবু কই?

মা বললেন—সে ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েচে আজ আট বছর—সে চলে যাওয়াতেই তো সংসার একেবারে গেল। কিছু নেই আর সে সংসারের।

আমি বললাম—রাসু, গরুজোড়া চুরি করিছিলি তুই?

রাসুও বুড়ো হয়ে পড়েচে। মাথার চুল বিশেষ কাঁচা নেই। গোঁপ সম্পূর্ণ পাকা। একটু কুঁজোমতো হয়ে পড়েচে।

একটু চুপ করে থেকে বললে-হ্যাঁ, বাবু। মিথ্যে বলে আর কি হবে, গরু নিয়ে গিয়ে একটা গাঁয়ের হাটে বিক্রি করি।

—দেশে যাস্‌নি?

—না বাবু, সেই টাকা নিয়ে সোজা রাজসাহী চলে যাই। ভয়ে দেশে ফিরিনি।

—কেন চুরি করলি?

—অদেষ্ট বাবু। সবই অদেষ্টের লিখন। তখন বয়েস কাঁচা ছিল, বুদ্ধি ছিল না। দুঃখু তো ঘুচলো না, সব রকমই করে দেখলাম বাবু। এখনরাতুলপুরের হিঙ্গল সর্দারের শুয়োর চরাই। ষোলো টাকা মাইনে আর খাতি দ্যায়। বুড়ো হয়ে পড়েচি, আর কনে যাবো এ বয়েসে—চকি ভালো দেখতি পাইনে—

মা বললেন—রাসু দুটো খাবি? হাঁড়িতে পান্তা ভাত আছে ওবেলার, দুটো খা—বোধ হয় আজ তোর খাওয়া হয়নি?

জগদানন্দপুরের সেই দিদির কথা অনেকদিন পরে আবার মনে এল। ভুলেই গিয়েছিলাম বটে। এখন মা'র ওই কথায় জগদানন্দপুরের দিদির সেই দেবীর মতো মূর্তিখানা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ভুলিনি দেখলাম, এতটুকু ভুলিনি—বাইরে ভুলেছিলাম মাত্র। কি জানি,এতদিন পরে বেঁচে আছেন কিনা!

মনোমোহনকে বললাম—ভায়া, আর চোদ্দো বছর পরে ওকে গ্রেপ্তার করে কি করবে? ছেড়ে দাও ওকে। এখন ও যেমন গরিব, আমিও তেমনি গরিব। ওকে জেলে দিয়ে আমার কি আর দুঃখু ঘুচবে?

রাসু হাড়ি কেঁদে আমার পা-দুটো জড়িয়ে ধরলো।

মা চোখ মুছতে মুছতে বললেন, আয় বাবা রাসু, ভাত দিইগে—রান্নাঘরের উঠোনে চল—তোমারও অদেষ্ট—আমাদেরও অদেষ্ট—চল বাবা—